International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-I, July 2017, Page No. 16-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও বিধানচন্দ্র রায়

বিপ্লব মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কালনা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

After the independence based on two Nation Theory' India was partitioned in two nations-India and Pakistan. Here religion was playing a very crucial role, mainly in two religions Hindu and Muslim. When India became Independent a new problem named refuge arose in the state of Punjab and west Bengal. The Pakistani Hindu refugee (East Pakistan, West Pakistan) came to India mainly in two states, one was Punjab another was west Bengal. After the partition of Bengal, what was the scenario of west Bengal, in my paper I'll discuss it and this contemporary situations, when east Pakistani Hindu refugees came to west Bengal, what were the challenges made by contemporary condition and as a second chief minister of west Bengal Bidhan Chandra Roy how to handle s and what were the initiatives taken by him. As well as how to solve these refugee problems and how much he was successful.

Key Words: Two Nation Theory, Refugee, East Pakistan, West Bengal, Partition.

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর কংগ্রেসে মুসলিমলিগ সদস্য ফজলুল হক কর্তৃক প্রথম দেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং এরপর মহম্মদ আলি জিন্নার এই প্রস্তাবে সুদৃঢ় সমর্থনের অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল ১৯৪৩-৪৬ সময়কাল পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার চরমতম পরিবেশ। আর এই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতাকে সামনে রেখেই একদিকে মুসলিমলিগের নেতৃবৃন্দ ও অন্যদিকে কংগ্রেস শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এই সমস্যার সমাধান স্বরূপ যে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, সেটি ছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ।

এরপর ১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট ভারত থেকে বিভক্ত হয়ে জন্ম নিল ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্থান নামক রাষ্ট্র।[১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ স্বাধীন হবার আনন্দে সারা ভারতবর্ষ যখন বিভোর, ঠিক তখন বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষকে এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি সেই ভাবে আনন্দমুখর করে তুলতে পারেনি। কারণ তাঁরা স্বাধীন হলেও, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাস করতে হবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিসাবে। স্বাধীন ভারতবাসী হবার দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এই পরিস্থিতি তাঁদের কাছে কোন ভাবেই কাম্য ছিলনা। এই প্রকার একটি আবেগ ও বাস্তবতাকে সামনে রেখেই বিভক্ত বাংলার অংশ পূর্ববাংলা থেকে আসা অসংখ্য হিন্দু সংখ্যালঘু মানুষ নিজেদের জাতিসত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায় নিয়ে বিভক্ত বাংলার অংশ পশ্চিম বাংলার আসতে শুরু করল।[২] এইসময় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের ঘটনাকে

প্রাথমিকভাবে সেই গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই মূহুর্তে পূর্ববঙ্গের অস্থির অবস্থার কারণে যে সমস্ত হিন্দুরা পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছে তাঁরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় ফিরে যাবেন। তাই সমস্ত মানুষের পূর্নবাসনার ওপর গুরুত্ব প্রদান না করে কেবল মাত্র তাদের জন্য অস্থায়ী কিছু শরণার্থী শিবির এর ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়েই প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর দায়িত্ব পালন সীমাবদ্ধ রাখেন। তার এই প্রাথমিক ভাবে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সংখ্যালঘুদের প্রতি উদাসীনতার কারণেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন মনোভাব লক্ষ করা গিয়েছিল।[৩]

এরপর ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগের ফলেই, এই সময় বিধানচন্দ্র রায় মূখ্যমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করলেন। এই সময় পশ্চিমবাংলার বহুবিধ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা। যদিও এই সমস্যার সূচনা মূলত স্বাধীনতা পরবর্তীকালে থেকেই শুরু হয়েছিল। এই প্রকার পরিস্থিতিতে বিধানচন্দ্র রায় পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের অদূরদর্শীতাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে উদ্যোগী হলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রথমদিকে উদ্বাস্তু বিভাগের ভরাপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং উদ্বাস্তুদের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলনা।[৪] এই প্রকার একটি পরিস্থিতিতে বিধানচন্দ্র রায় মূখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পর উদ্বাস্তু সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে আলাদা একটি ডিরেক্টরেটের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে ব্রজকান্ত গুহকে নিযুক্ত করলেন। এক্ষেত্রেও এই নতুন ডিরেক্টরেটের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলনা। এটি পুরাতন বিভাগের অধীনে কাজ করছিল। বিধানচন্দ্র রায়কে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে এই প্রকার একটি প্রশাসনিক কাঠামো পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই তখন পূর্ণবাসন মহাধ্যক্ষ ব্রজকান্ত গুহ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হলেন তখন বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়টিকে সামনে রেখে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে এই সময় বিধানচন্দ্র রায় স্থির করলেন যে, পূর্ববাংলা থেকে আগত অসংখ্য সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে তিনি একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন এবং সর্বোপরি বিধানচন্দ্র রায় পূর্বে প্রচলিত কিছু রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থির করলেন যে, উদ্বাস্তু বিভাগের সচিব ও মহাধ্যক্ষ একই ব্যক্তি হবেন।[৫] আসলে বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুসমস্যার মোকাবিলা করতে প্রশাসনিক কাঠামোকে অধিক গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে পুনর্বাসন বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। সুতরাং উক্ত ঘটনাক্রম থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, বিধানচন্দ্র রায়ের ভাবনা চিন্তা সবসময় গতানুগতিক পথে পছন্দ করত না। তিনি নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে, অবস্থান ও পরস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে পরিবর্তন আবশ্যক, সেখানে পরিবর্তন সাধনে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না।[৬]

অবশেষে বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ হিসাবে পুনর্বাসন দপ্তর স্থাপন করলেন। ১৯৪৯ সালের ১৫ ই জুন তারিখে এই বিভাগের মহাধ্যক্ষ ও সচিব হিসাবে হিরণ্ময় ব্যানার্জীকে নিয়োগ করলেন। এক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু পূর্নবাসন সংক্রান্ত কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পুনর্বাসন কমিটি গঠন করলেন এবং এই কমিটির সভাপতি হলেন নিজেই। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সতিশচন্দ্র দাশগুপ্ত, রেনুকা রায়, জীবনান্দ ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ প্রমুখ। এই সময় বিধানচন্দ্র রায়ের একান্ত প্রচেষ্টার কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবার আশ্বাস দেন ও সর্বোপরি তিনি উদ্বাস্তু সমস্যার বিষয়টি প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। এবং তাঁর এই উদ্বেগের অন্যতম নিদর্শন ছিল ১৯৪৯ সালের ১ লা ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর লেখা একটি চিঠি। যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে পশ্চিমবাংলাকে পুনর্বাসন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এবং পাশাপাশি পাঞ্জাব প্রদেশের উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন।[৭]

সুতরাং বিধানচন্দ্র রায় মুখমন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকেই যে সমস্যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাচ্ছিল, সেক্ষেত্রে তাঁর সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলিত প্রশাসনিক কাঠমো নির্মাণের মধ্যদিয়েই এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভবপর ছিল। আর এখানেই বিধানচন্দ্র রায়ের দূরদৃষ্টি; মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করার মানসিকতা ফুটে উঠেছিল এবং সর্বোপর সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বীজ স্বাধীনতা পূর্ব নেতৃবর্গ বপন করেছিলেন, সেই ভুলের সংশোধনে এটি ছিল তাঁর অনন্য এক প্রচেষ্টা।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বিধানচন্দ্র রায়ের ভূমিকা (প্রথম পর্ব): এবার আসা যাক স্বাধীনতার পর বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের (প্রথম পর্ব) ক্ষেত্রে ভূমিকা কী ছিল সেই প্রসঙ্গে। বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ে প্রথম যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল, সেটি ছিল সমকালীন সময়ে যত উদ্বাস্তু পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্রয় শিবির গুলিতে অবস্থান করেছিল তাদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ১৯৪৯-৫০ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ এল যে, উদ্বাস্তু খাতে বরাদ্দ অর্থের মাধ্যমে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সেটি না করা যায় তবে সংশ্লিষ্ট খাতের অর্থ ফেরৎ যাবে। এক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র নির্দেশ দিলেন যাতে এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং তিনি নির্দিষ্ট পরিকল্পনারর মধ্য দিয়ে এই অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে দেখা গেল যে, ঐসময় অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গুলিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার অবস্থান করছিল তাদের সকলেই পুনর্বাসন যোগ্য ছিলনা।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে এই যোগ্যতার হিসাবে বলা হয়েছিল, যেসব পরিবারে বিধবা বা বৃদ্ধ বা বিধবা অসমর্থ পুরুষ বর্তমান রয়েছে তাদেরকে পুনর্বাসন অযোগ্য বলা হয়েছে। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় শিবির গুলিতে মোট ৭০,০০০ উদ্বাস্তু মানুষ বর্তমান ছিল। তাদের মধ্যে ৭,৫০০ জন পুনর্বাসন অযোগ্য বলে বিবেচিত ছিল। আর বাকি ৬২,৫০০ জন মানুষের পুনর্বাসনই ছিল তৎকালীন বিধানচন্দ্র রায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও যে সব পরিবার বা ব্যক্তি পুনর্বাসন অযোগ্য ছিল তাদের জন্য ভিন্ন আশ্রয় শিবিরের বন্দোবস্ত করার বিষয়টি বিধানচন্দ্র রায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন।[৮]

আরেকটি বিষয় এই সকল উদ্বাস্তু মানুষ গুলির পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেটি হল-এই সকল উদ্বাস্তু মানুষ অতীতে কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি ও তার পরিবারকে, তার পেশার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী কোন স্থানে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা করা। এইক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা থকে আগত সংখ্যা লঘু উদ্বাস্তুদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল- (ক) নিম্ন- মধ্যবিত্ত শ্রেণি (প্রথম শ্রেণি); (খ) কৃষিজীবি (দ্বিতীয় শ্রেণি); (গ) তাঁতি (তৃতীয় শ্রেণি) (ঘ) জেলে (চতুর্থ শ্রেণি)। উক্ত এই চারটি শ্রেণির মধ্যে উদ্বাস্তুরা কোন শ্রেণিভুক্ত তার উপর ভিত্তি করে তাদের বসবাসযোগ্য স্থান নির্দিষ্টি করা হয়েছিল। এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, এই চারটি শ্রেণির মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষই ছিল অধিক। আর এর কারণ হিসাবে হিরণ্ময় ব্যানার্জী তাঁর বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তখন ও পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিলনা, যেখানে মুসলমান অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা ভারতে চলে আসবে। এর কারণ ছিল রাজনৈতিক সচেতনতা। তাই বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পর রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষগুলিই সংখ্যালঘু হয়ে পূর্ববঙ্গে থাকার তুলনায় পশ্চিম বাংলায় আসে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়াকে অধিক কাম্য বলে মনে করেছিল।।[৯]

এইসময় বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারের সামনে যে সমস্যাটি প্রকটরূপে দেখা দিয়েছিল, সেটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের আশ্রয় শিবির অবস্থানরত বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের জন্য খালি জমির ব্যবস্থা করা। এই সমস্যা সমাধানে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রশাসন প্রাথমিক ভাবে নজর দিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরবর্তী কালে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত (অস্ত্রশস্ত্র রাখা, বিমান উঠানামা করার স্থান) বিশাল পরিমাণ জমি খালি পড়ে থাকায় এই জমিগুলি উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্য ব্যবহারে মধ্য দিয়ে এই সমস্যার কিছু সমাধান সম্ভব হয়েছিল। যেমন হাবড়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হাজার একর জমি ছিল, চাদমারিতেও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখার জন্য ঐ এলাকার

একটি বিশাল অংশ পতিত অবস্থায় ছিল। এইভাবে আরোও বেশকিছু এইধরনের জমি খুঁজে বের করে উদ্বাস্তু পুর্নবাসনের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা শুরু হল। [১০] আর যেহেতু উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মানুষের পেশার ওপর গুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন স্থান নির্দিষ্ট হত, তাই পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জমির অপ্রতুলতাও বর্তমান ছিল এবং জমি যদিও পাওয়া যেত সেক্ষেত্রেও তাদের অধিগ্রহণের বাধার সম্মুখীন হতে হত। এই সমস্যার সমাধানে বিধানচন্দ্র রায় পূর্বতন ইংরেজ সরকার কর্তৃক তৈরি ভূমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন করে, নতুন ভূমি অধিগ্রহণ আইন আনলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ আইন ছিল মন্থর গতি সম্পন্ন এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হত জমির বাজার দর অনুসারে। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায়ের এর নতুন আইনটি ছিল অনেক বেশি নমনীয় এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিধানচন্দ্র রায়ের যুক্তি ছিল যে, জমির দর বৃদ্ধিতে যেহেতু জমির মালিকের কোন হাত নেই, তাই জমির মালিকের জমির বর্ধিত দাম পাবার কোন অধিকার তাদের নেই। আসলে এই সময় বিধানচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার জন্য জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেইক্ষেত্রে তাঁর মতে এই জমির দাম বাড়ার ক্ষেত্রে জমির মালিকের কোন হাত নেই। তাই তিনি জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির মালিককে ক্ষরিপূরণ হিসাবে ১৯৪৬ সালের জমির বাজার দর অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে নতুন আইনে উল্লেখ করেন। আর এই নতুন জমি অধিগ্রহণ আইনকে সামনে রেখে বিধানচন্দ্র রায় গড়ে তুললেন "ভূমি উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি"। এই কমিটির কাজ ছিল জমি অধিগ্রহণের বিষটি তত্ত্বাবধান করা এবং জমি অধিগ্রহণে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তার নিস্পত্তিতে ভূমিকা পালন করা।

সুতরাং বিধানচন্দ্র রায় এই নতুন ভূমি অধিগ্রহণ আইনের মাধ্যমে একদিকে যেমন। সমকালীন সময়ের উন্নয়নের কাজকে দ্রুততার সঙ্গে করার প্রতিবন্ধকতার দূর করা সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে ঐসময় অন্যতম একটি সমস্যা উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য অধিগ্রহণের কাজটি অনেক সহজ করে তুলেছিল।[১১]

১৯৫০ সালের বিপুল উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ ও বিধানচন্দ্র রায়:

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সাপ্তাহের পূর্বে বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর প্রশাসন পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের মধ্যদিয়ে, উদ্বাস্তু সমস্যার ক্ষেত্রে মোটামুটি স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এই স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশের স্থায়িত্ব খুব বেশিদিন স্থিতিশীল ছিলনা। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিক থেকেই খবর এসেছিল যে, পূর্ববাংলার অন্তর্গত বাগের হাট অঞ্চলে মুসলমানদের হাতে সংখ্যালঘু হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুনও হয়েছে। [১২] আর এই অত্যাচারের ঘটনার চরম রুপ শুরু হল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই। [১৩] বিশেষ করে খুলনা, ফরিদপুর, যশোর জেলার নমশুদ্র মানুষের উপর অত্যাচারের ফলে সেই অঞ্চলের অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশুদের একটি বিশাল অংশের বনঁগা সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসছিল। প্রথম দিকে পাকিস্থানি এই ঘটনা অস্বীকার করলেও বিধানচন্দ্র রায়ের এই বিষয়ে কঠোর মনোভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্থানের মূখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার কথা স্বীকার করেন। এই প্রকার একটি পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর এই বীভৎস অত্যাচারের ঘটনা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল বরিশালে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, একদিন সন্ধেবেলা বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে খবর এল যে, খুলনা থাকে বরিশাল যাবার একটি ট্রেনের কয়েকটি কামরায় শুধুমাত্র রক্তের দাগ, ছেড়া শাড়ির অংশ ভাঙা শাঁখ ও চুড়ি বিচ্ছন্ন ভাবে ছড়ানো। আর এই ঘটনা থেকেই বিধানচন্দ্র রায় বুঝে গিয়েছিলেন, ওপার বাংলার মানুষ কি বীভৎস অবস্থার মধ্যদিয়ে সেখানে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উদ্ধারে নিজেই উদ্যোগী হলেন। রেল ষ্টেশন, স্টীমার ঘাট, আর ঢাকা বিমান বন্দরে আটকে থাকা সংখ্যালঘু হিন্দুদের উদ্ধারের পরিকল্পনা শুরু করলেন। এক্ষেত্রে প্রথমে তিনি ১৬টি প্লেন ভাড়া করে ঢাকায় পাঠালেন, এই সমস্ত আটকে থাকা মানুষদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বিধানচন্দ্র রায় একদা এয়ার ওয়েজ ইন্ডিয়া লিমিটেড নামক একটি বিমান সংস্থার

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপিতি ছিলেন এবং সর্বোপরি বিধানচন্দ্র রায় ঐ কোম্পানিকে টেলিফোন করে যতগুলি সম্ভব প্লেন ঢাকায় পাঠাতে অনুরোধ করেলেন। ও ঐ সংস্থাকে বললেন যে, ঐ সমস্ত উদ্ধারিত মানুষগুলির কাছে থেকে যেন কোন প্রকার অর্থ না নেওয়া হয় । [১৪]

দেখতে দেখতে পূর্ববাংলা থেকে আগত সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়তে লাগল। এই সমস্ত মানুষ গুলির দেশত্যাগ এতটাই জরুরী হয়ে উঠল যে, তাঁরা যে পথটি সামনে পাচ্ছিল তাকে ধরেই অগ্রসর হচ্ছিল। রেলপথ ছিলই, যারা সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করত তারা পায়ে হেটেঁ চলে আসছিল। আসলে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গে আসার তিনটি পথই (জল, স্থল, আকাশ) এমন অবস্থার মধ্যে পাওয়া সহজ ছিল না। পূর্ব-বাংলার এমন অনেক অঞ্চল ছিল, যেখানে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের বাখেরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অঞ্চলের গৃহহীন মানুষ পরিবহনের অভাব বিভিন্ন স্টিমার ঘাটে একত্রিত হয়েছিল। এই ঘটনার কথা বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পৌছলে, এক্ষেত্রে তিনি তাদের উদ্ধারে তৎপর হন। এমন অবস্থায় তিনি ব্রিটিশ আমলে পরিবহন কার্যে নিযুক্ত দুটি স্টিমার কোম্পানির (আই.জি.এস.এন এবং বি.আই.এস.এন) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নদীর উপকূলে আটকে থাকে সংখ্যালঘুদের দেশে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনা অনুসারে উদ্ধার কাজে নিযুক্ত ১৫ টি স্টিমারের মাধ্যমে ঐ অঞ্চল থেকে আটক মানুষগুলিকে নিয়ে কলকাতার অভিমুখে রওয়ানা দেয়। অবশেষে একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এই স্টিমারগুলিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এইভাবে বিধানচন্দ্র রায়ের মানবদরদী মন এই ধরনের জটিল সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠেছিল। [১৫]

এইসময় সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার এই বিভৎসতা কেবলমাত্র পূর্ববাংলায় সীমিত ছিল না। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের অত্যাচারের ঘটনা যখন এপার বাংলার মানুষের কাছে এসে পৌছাল, তখন পশ্চিম বাংলায়ও শুরু হল সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উওর অত্যাচারে বিভিন্ন ঘটনা। হাওড়া, কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার বেশকিছু যায়গায় এর তীব্রতা পরিলক্ষিত হল। এমতাবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় এই অস্থির পরিবেশ রোধে ঐসব অঞ্চলের প্রশাসনকে কারফিউ জারি করার নির্দেশ দিলেন। পুলিশ ও মিলিটারি রাস্তার নামানো হল। এত প্রকার একটি অস্থির পরিবেশের মধ্যে অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ.কে.ফজলোল হোক কলকাতায় এলেন বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তাঁর কলকাতায় অস্থানরত পরিবারের নিরাপত্তা সুবন্দোবস্ত করার স্বার্থে। এমতবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন এবং অবিলম্বে পূর্বে বাংলার অন্তর্গত বরিশালে যেতে অনুরোধ করলেন। কারণ কলকাতায় ফজলুল হক খুন করা হয়েছে, এই গুজবে বরিশালে দাঙ্গা বীভৎস আকার নিয়েছে। তাই বিধানচন্দ্র রায় ফজলুল হককে দ্রুত বরিশালে গিয়ে নির্বাচারে ওখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা র্রোধে অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক দ্রুত বরিশালে গিয়েছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের শান্তি স্থাপনে নিজেকে নিযুক্তি করেছিলেন।[১৬]

এছাড়া ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একদিকে যেমন সংখ্যালঘু মানুষ গুলিকে ঘরছাড়া করতে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে দুটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এইসময় যে বিপুল উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত এসে পড়েছিল তারই ফলস্বরূপ পশ্চিম বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে দেখা গেল সারা ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের পরিমানের ঘাটতি প্রায় দুই লাখ টনের অধিক ছিল। সারা দেশের ন্যায় পশ্চিম বাংলাতেও খাদ্যশস্যের অভাব বর্তমান ছিল এবং যার ফলে খাদ্য বন্টনের ব্যবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠল। বিশেষ করে চালের যে মজুত ভাণ্ডার ছিল তার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। এমন অবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় খাদ্য শস্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্দেশে প্রতিসাপ্তাহে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন রাখতেন। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিধানচন্দ্র রায় এইসময় তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের চাল কম পরিমাণ খাবার জন্য অনুরোধ করেন, এমনকি নিজেও এইসময় ভাত খওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। [১৭]

এছাড়াও বিধানচন্দ্র রায় এইসময় একদিকে যেমন পুর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পাশাপাশি ঐসময় যারা পূর্ববঙ্গ থেকে না আসতে পেরে ভয়ানক অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, তাঁদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে জানালেন যে এইসমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত দ্বিতীয় বিকল্প পথ আর নেই। এইসময় তার এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের বেশকিছু নেতৃত্ব (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী) সহমত পোষণ করেছিলেন। বিধানচন্দ্র রায় এখানেই থেমে থাকেন নি তিনি এই সময় পূর্ববাংলায় অবস্থানরত সংখ্যালঘু মানুষগুলিকে উদ্ধারের বিভিন্ন প্রস্তাব দিতে শুরু করলেন। যেমন-সংখ্যালঘু বিনিময়; যদি পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দ হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে না পারেন, তবে সেই সমস্ত সংখ্যালঘুদের জন্য পূর্ববঙ্গের কিছু জমি দখল করে নেওয়া ইত্যাদি। এইসময় বিধানচন্দ্র রায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে তৎকালীন সেনা প্রধানের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন।[১৮]

এতদসত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেহেরু যুদ্ধের ঝুকি নিতে চাননি। তাঁর মতে সেই সময় উভয় দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ হোত, তাহলে সেক্ষেত্রে উভয় দেশের মানুষ ভয়ংকর দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়বে এবং তার ফল হবে আরও মারাত্নক। তাই সম্ভবত নেহেরুর উদ্যোগেই শান্তি স্থাপনের উদেশ্যে পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান পূর্ব বাংলায় এলেন এবং দাঙ্গা পীড়িত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন। এবং সর্বোপরি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। আসলে সেইসময় ভারত ও পাকিস্থান উভয় সরকারই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই প্রকার একটি পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে; তবে তার পরিণামে যুদ্ধ অবিশম্ভাবী।

এরপর ১৯৫০ সালের ২ রা এপ্রিল পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী দিল্লি এলেন। দীর্ঘ কয়েকদিন আলোচনার পর দুই বাংলার সংখ্যালঘু সমস্যা, ত্রিপুরা ও আসাম সম্পর্কেও উভয় সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। [১৯] এই চুক্তিই "নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি" নামে পরিচিত হল। এই চুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্থান সরকার নিজ দেশের সংখ্যালঘু মানুষের নাগরিকত্ব প্রদান করবে এবং সর্বোপরি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নেহেরু ও লিয়াকৎ চুক্তির ফলে প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বেশকিছু মন্ত্রী (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী) এই চুক্তির বিরোধিতায় সরব হন এবং ধরে নেওয়া হয়েছিল বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর মন্ত্রীসভাও এই চুক্তির বিরোধিতায় পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বিধানচন্দ্র রায় এই সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্তপাতের বীভৎস স্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে নেহেরু ও লিয়াকৎ আলির চুক্তির শর্তাবলী পালনে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এইসময় থেকেই মূলত পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু আগমণ অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল এবং বিধানচন্দ্র রায় নিজে এইসময় ঢাকা গিয়ে পূর্ব বাংলার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন, কিভাবে এই সমস্ত সংখ্যালঘু মানুষগুলির মধ্যে যতটা সম্ভব ভরসা ফিরিয়ে আনা যায়। [২০]

দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও বিধানচন্দ্র রায়:

১৯৫০ সালের পূর্বে অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবার যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দুই বাংলার সংগঠিত ভয়ঙ্কর দাঙ্গার ফলে পূর্ববাংলা থেকে যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ পশ্চিম বাংলায় এসেছিল, তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পূর্বের নীতির পরিবর্তন করে। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গে নতুন নীতিতে বলা হয় যে, এই সময় আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কেবলমাত্র অস্থায়ী কিছু উদ্বাস্তু শিবির খোলার মধ্যদিয়ে দায়িত্ব সীমিত করা হবে। এক্ষেত্রে এই উদ্বাস্তুদের জন্য কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ভেবেছিল পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা হবে দুই লক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু কেন্দ্রের এই ধারণা সঠিক ছিলনা। কারণ এইসময় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাড়িয়েছিল পাঁচলক্ষ পর্যন্ত। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতির উদ্বাস্তু আশ্রয় দেবার ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য গুলির দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। স্থির হয়েছিল আসাম ও উড়িষ্যা এই দুটি রাজ্য

প্রত্যেকে ২৫০০০ করে উদ্বাস্তু দায়িত্ব নেবে। বিহার নেবে ৫০,০০০ এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছিল ১০০০,০০০ উদ্বাস্তু। একটু গভীর ভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত নতুন নীতি পশ্চিমবঙ্গের বরং ভালই হয়েছিল। কারণ সেই নীতিতে উদ্বাস্তুদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত ছিল। [২১]

এমতবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত নতুন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উদ্বাস্তু সমস্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। এইসময় বিধানচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ শুরু হল। যেমন তাঁর তত্ত্বাবধানেই চব্বিশ পরগণার উত্তর সীমান্তে তিনটি আশ্রয় শিবির খোলা হল। এছাড়াও ডাঃ রায়ের অনুমোদন সাপেক্ষে রানাঘাটের কাছে অবস্থিত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যবহৃত (ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত) যে, শস্যভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল সেখানে প্রায় ১৮০০ পরিবারের আশ্রয় শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ঐ সময় আরেকটি সেনাঘাঁটির সন্ধান পাওয়া যায় (ধুবলিয়াতে) যেখানে প্রায় ৭৫,০০০ মানুষের আশ্রয় শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। [২২]

সেইসময় ক্রমেই পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু সমস্যা এত বিরাট আকার ধারণ করল যে , প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই গভীর সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তাই পণ্ডিত নেহেরু ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে প্রথম উদ্বাস্তু সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পশ্চিমবঙ্গে এলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাতের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমতবস্থায় বিধানচন্দ্র রায় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বনগাঁইয় অবস্থিত অস্থায়ী শিবিরগুলিতে পৌছলেন। প্রধানমন্ত্রী উদ্বাস্তুদের মানসিক অবস্থা, অত্যাচারের কাহিনি সরাসরি উদ্বাস্তুদের মুখে শুনলেন এবং দিল্লি ফিরে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী দিল্লি যাবার পরে ১৯৫০ সালের ১৫ ই মার্চ পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এলেন। এবার তিনি বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি বৃহৎ উদ্বাস্তুশিবিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই সময় বিধানচন্দ্র রায় রানাঘাটে অবস্থিত কুপার্স ক্যাম্পে নিয়ে গেলেন। এই শিবিরে প্রায় ৪০,০০০ উদ্বাস্তুর সঙ্গে প্রদানমন্ত্রী সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনে সংগঠিত বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শুনলেন। এইসময় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে তাঁদের বীভৎস জীবন কাহিনি প্রধানমন্ত্রীকে ব্যপক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ এই সময়ের কিছুদিন পরেই নেহেরু ও লিয়াকৎ আলি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং সর্বোপরি এইসময় বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে উদ্বাস্তু আশ্রয়স্থল পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেই ১৯৫০ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রস্তুত উদ্বাস্তু নীতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। [২৩]

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের পরবর্তী কাল থেকেই পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু জনগণ আসার সংখ্যা ক্রমাগত কমতে লাগল। এই প্রকার একটি পরিস্থিতিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গুলিতে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রস্তাব ঘোষণা করলেন যে, ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে পুনর্বাসন সম্পূর্ণ করতে হবে।[২৮] এইরকম একটি প্রস্তাবের অপেক্ষায় অপেক্ষারত বিধানচন্দ্র রায় তাঁর প্রশাসনকে দ্রুত উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নির্দেশ দিলেন। তাঁর উদ্যোগেই উত্তর ও দক্ষিণের রাঢ়বঙ্গের অনুর্বর জমিতে উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে তুললেন। এছাড়াও তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সহযোগিতায় বিহারে শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি, ওড়িশা মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী খনিজ সম্পদে ভরপুর রায়গড় অঞ্চলে বাঙালি উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে তুললেন। ক্ষুদ্র পশ্চিম বাংলায় পূর্ব বাংলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভব নয়, তাই তিনি বিকল্প হিসাবে, কৃষিজীবি ও মৎসজীবি উদ্বাস্তুদের জন্য আন্দমান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করলেন। এইসময় কলকাতা শহরের মধ্যে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংগঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত রাজা মহারাজা কর্তৃক ব্যবহৃত দশ পনেরো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অট্টালিকা, বাগানবাড়ি খালি অবস্থায় পড়ে ছিল। বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার এইগুলিকে এইসময় প্রাথমিক ভাবে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী বাসভূমি গড়ে তোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই উদ্বাস্তু জনগণ অট্টালিকা ও প্রসাদ সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে অসংখ্য কলোনি গড়ে তুলেছিলেন। এইসময় বিধানচন্দ্রের সরকার মৌখিক ভাবে পুলিশের কাছে বলেছিল যে, জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ যেন ডায়রিভুক্ত না

করা হয়। সম্ভবত ভবিষ্যতে এই জমির উত্তারিকারিরা জমির মালিকানা চাইতে পারে এই ভেবেই ১৯৫৩ সালে তিনি জমিদারি দখল আইন পাশ করিয়েছিলেন। [২৫]

সুতরাং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও বিধানচন্দ্র রায়, এই গবেষণা পত্রটির যদি একটু পর্যালোচনা করা যায়, তবে লক্ষ্য করা যাবে যে, স্বাধীনতা পূর্ব কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা লোভী রাজনৈতিক লড়াইয়ের ফলে জন্ম হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাকিস্থানি নামক রাষ্ট্র। আর এইক্ষেত্রে রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান না হয়ে, ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দুটি দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর চরম অত্যচারে বিরল কাহিনি। তাই যখন পূর্ব বাংলার অসংখ্য সংখ্যালঘু হিন্দু নিজেদের সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, নিজের সন্তান তথা আত্মীয় পরিজনের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা বাস্তুহারা হয়ে ছুটে আসছে পশ্চিমবাংলায় নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। এমতবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সমস্যাকীর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে, বিধানচন্দ্র রায় মানবতার খাতিরে, রাজনৈতিক চক্রান্তের যোগ্য জবাবের মধ্যদিয়ে নিজের সমকালীন শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ভুল সংশোধনে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং ততক্ষণ লড়াই করেছেন যতক্ষণনা প্রতিটি উদ্বাস্তু মানুষের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থনির্দেশ

১। ঘোষ, বিনয়ভূষণ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালি, গ্রন্থরশ্মি, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৭৯।
২। ঐ. পৃ. ৭৮, ৭৯।
৩। সেনগুপ্ত, ডাঃ নীলেন্দু, বিধানচন্দ্র ও সমকাল, একুশ শতক প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৩৭।
৪। ব্যানার্জী, হিরণ্ময়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১ পৃ. ২০।
৫। ঐ, পৃ. ২৬-২৭।
৬। ঐ, পৃ. ২৭।
৭। সেনগুপ্ত, ডাঃ নীতিশ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জীবন ও সমকাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৯৫।
৮। ব্যানার্জী, হিরণ্ময়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩০।
৯। ঐ, পৃ. ৩২।
১০। ঐ, পৃ. ৩২, ৩৩।
১১। ঐ, পৃ. ২৩, ২৪।
১২। ঐ, পৃ. ৩৮।
১৩। চক্রবর্তী, সরোজ, মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সুরাওয়ার্দি থেকে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত: ১৯৮৪-১৯৬২, দে বুক স্টোর, কলকাতা জানুয়ারি , ১৯৬৭, পৃ. ১০০
১৪। ব্যনার্জী, হিরণ্ময়, পুর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০১।
১৫। ঐ, পৃ. ৪৮, ৮৯।
১৬। গুহরায়, নগেন্দ্রকুমার, ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন চরিত্র, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ২০০১, পৃ. ২২৪।

১৭। সেনগুপ্ত, নীতিশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০৬।
১৮। ঐ, পৃ. ১০০।
১৯। চক্রবর্তী, সরোজ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০৬।
২০।। ঐ, পৃ. ১১৩।
২১। ব্যনার্জী, হিরণ্ময়, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪৪, ৪৫।
২২। ঐ, পৃ. ৪৬, ৪৭।
২৩।ঐ, পৃ. ৫৮।
২৪। ঐ, পৃ. ৭৯।
২৫। সেনগুপ্ত, ডাঃ নীতিশ, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০৪, ১০৫।